মেগা প্রকল্পের যৌক্তিকতা

মাবরুর মাহমুদ

আইএফডি স্পেশাল আর্টিকেল ৩

জানুয়ারি ১৭, ২০১১

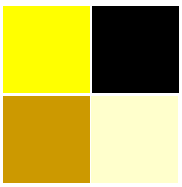

[এই রচনার সকল মন্তব্য এবং যে কোন ভুল ভ্রান্তির জন্য লেখক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। এর জন্য অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়]

মেগা প্রকল্পের যৌক্তিকতা

আওয়ামী লীগ নের্তৃত্বাধীন মহাজোট সরকার অতি সম্প্রতি শাসনকালের দুই বছর পূর্ণ করল। সরকারের এই দুই বছর পূর্তিতে আইএফডি'র পক্ষ থেকে আমি সরকার প্রধান মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সরকার সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সরকারের দুই বছরের পূর্তিতে আজ সকলেই হয়তো স্বীকার করবেন বিগত দুই বছরে এই সরকারের সাফল্য যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে ব্যর্থতাও। সরকার যেমন বিভিন্ন খাতে সাফল্যের নজির রেখেছে, তেমনি এমন অনেক খাত রয়েছে যেখানে মানুষের প্রত্যাশা পূরণের মত কাজ সম্পাদিত হয়নি।

তবে আজ আমরা সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে কোন প্রকার আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে এই লেখা লিখতে বসিনি। আজকের স্পেশাল আর্টিকেলের মূল উদ্দেশ্য সরকারের গৃহীত তিনটি মেগা প্রকল্পের বিষয়ে আমাদের অভিমত সকলের সাথে শেয়ার করা। এই তিনটি মেগা প্রকল্প হল (১) এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, (২) বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এবং (৩) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিটি।

এই তিনটি মেগা প্রকল্প নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ফোরামে একাধিক ব্যক্তিবর্গ এবং বিশেষজ্ঞ তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। আমরা যেহেতু বিগত ফেব্রুয়ারী ২১, ২০১০ তারিখে "**ঢাকা নগরীর যানজট নিরসনে আইএফডি'র প্রস্তাবনা**" শীর্ষক একটি পলিসি পেপার প্রকাশ করেছি, সেহেতু সেই বিষয় সংশ্লিষ্ট তিনটি মেগা প্রকল্পের ব্যাপারে নিজস্ব ধ্যান ধারণা সকলের সাথে শেয়ার করার এক প্রকার তাগিদ থেকেই এই স্পেশাল আর্টিকেলের জন্ম।

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

মিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের উদ্দেশ্যে যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে, তার মোট দৈর্ঘ্য হবে

প্রায় ২৬ কি.মি.। এটি হজরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শুরু হয়ে রেললাইনের পাশ দিয়ে কমলাপুর পর্যন্ত যাবে এবং এরপর আরো দক্ষিণে প্রসারিত হবে।

ঢাকা শহরের যানজট বর্তমানে এক দুর্বিষহ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তাই এই যানজট দ্রুত কমানোর জন্য এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েকে অনেকেই একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান হিসাবে মনে করছেন। সম্প্রতি ক্যাবিনেটে এই প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে এবং মিডিয়াতে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী আগামী ১৯ তারিখে সরকার তিন বছরের মধ্যে এই এক্সপ্রেসওয়েটি নির্মাণের জন্য ইটালিয়ান-থাই ডেভলপমেন্ট কোম্পানির সাথে চুক্তি করবে।

প্রকল্পটির মোট খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ২৫০ কোটি ইউএস ডলার যা বর্তমান টাকার মূল্যে প্রায় ১৭৫০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৩০% বা ৫২৫০ কোটি টাকা সরকারকে বহন করতে হবে। বাকি টাকা ইটালিয়ান-থাই কোম্পানি তাদের নিজস্ব মূলধন থেকে ব্যয় করবে যা পরবর্তীতে তারা তুলে আনবে টোল আদায়ের মাধ্যমে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এই মেগা প্রকল্পটির বাস্তবায়নের যৌক্তিকতা কতটুকু, তা নিয়ে আমরা আমাদের মতামত তুলে ধরতে চাই।

শুরুতেই বলা দরকার, আমরা ঢাকা শহরে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে করার বিরোধী নই, তবে এখনই এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সরকারি সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আমাদের অবস্থান।

আমরা মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্যান্য সকল প্রকল্পের আগে যদি এই মেগা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে তা ঢাকা শহরের যানজট পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করে তুলবে। নীচের সেকশনে আমরা আমাদের যুক্তিগুলি একে একে পেশ করছি।

ঢাকা শহরের মত একটি জনবহুল এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত নগরীতে যে কোন ট্রান্সপোর্ট পরিকল্পনাই করা হোক না কেন, তার মূল উদ্দেশ্য থাকতে হবে জনগণকে নিজেদের ব্যক্তিগত বাড়ি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করে একটি আরামদায়ক এবং আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে মানুষ এই গণপরিবহণ ব্যবহারে উৎসাহিত হয়। এই

ধরণের একটি আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে উঠলে যারা বর্তমানে গাড়িতে চড়তে বাধ্য হচ্ছেন, তারাও এই গণপরিবহণে যাতায়াতে উৎসাহিত হবেন।

ফলে এই গণপরিবহণ খাতে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে এবং উন্নত হবে সামগ্রিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা।

সামগ্রিক পরিবহণ পরিকল্পনার এই মূল উদ্দেশ্য যাতে সফল হয়, সেজন্য সরকারকে শুধু একাধিক প্রকল্প হাতে নিলেই চলবে না, বরং এই সকল প্রকল্পের বাস্তবায়নকালকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে পুরো পরিকল্পনার সামগ্রিক এই উদ্দেশ্যটি ব্যাহত না হয়।

যেমন, সরকার যদি একটি বাস ভিত্তিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা তৈরি না করেই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বাস্তবায়নে বেশি আগ্রহী হয়, তাহলে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পরেই দেখা যাবে যে কোন ব্যক্তি তার গাড়ি চালিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের উপর দিয়ে উত্তরা থেকে মাত্র ১৫ মিনিটে মতিঝিল চলে যেতে পারছেন। একই সময়ে যদি সরকার একটি উন্নত বাস ব্যবস্থা চালু করে, তাহলে দেখা যাবে, যারা গাড়ির মালিক, তারা আর বাসে উঠছেন না। কারণ তারা যদি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করে অতি দ্রুত তার গন্তব্যে চলে যেতে পারেন, তাহলে তারা কষ্ট করে বাসে উঠতে যাবেন কেন?

এই ধারা অব্যাহত থাকলে শহরে বাসের সাথে সাথে প্রাইভেট কারের সংখ্যাও বাড়বে। অবশেষে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যখন ঢাকাবাসী আবারো যানজটের কবলে পড়বেন। এখন আমরা দেখছি এক তলা ট্রাফিক জ্যাম। কিন্তু তখন হবে দুইতলা ট্রাফিক জ্যাম।

তাই দীর্ঘমেয়াদে যাতে এই ধরণের উল্টো পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেজন্য সরকারকে বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কালকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে পরিকল্পনার সামগ্রিক এই উদ্দেশ্যটি ব্যাহত না হয়। ঢাকা শহরের জন্য ২০ বছর মেয়াদী যে **কৌশলগত পরিবহণ পরিকল্পনা** বা **এসটিপি** হাতে নেয়া হয়েছে, তাতেও কিন্তু এই উদ্দেশ্যটি প্রতিফলিত হয়েছে।

যেমন, এসটিপি বাস্তবায়নের **প্রথম পর্যায়ে** অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে ২০ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের তাগিদ দেয়া হয়েছে তাতে কিন্তু এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বাস্তবায়নের কথা বলা হয়নি; শুধু নকশা এবং কারিগরি বিষয় পুনর্মূল্যায়নের তাগিদ দেয়া হয়েছে। যে ২০ টি প্রকল্পের বাস্তবায়নের তাগিদ দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

- তেজগাঁও টানেল নির্মাণ
- বেশ কয়েকটি সংযোগকারী রাস্তা তৈরি
- ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
- বিআরটি লাইন ১ এবং ২ বাস্তবায়ন
- প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

এই বিশটি প্রকল্পের মধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রোরেল ইত্যাদি ব্যয়বহুল প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুধুমাএ নকশা, এবং কারিগরি বিষয়গুলি চূড়ান্ত করার কথা বলা হয়েছে; বাস্তবায়নের কথা বলা হয়নি।

এসটিপি'র পরামর্শকে এড়িয়ে গিয়ে কোন নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া যাবে না, এমন কোন কথা আমরা বলছি না। তবে এই ধরণের কোন প্রকল্প যদি হাতে নেয়া হয় অথবা দ্বিতীয় পর্যায়ের কোন প্রকল্পকে যদি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথম পর্যায়ে সবার আগে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাহলে তার পিছনে সরকারের কাছে শক্ত যুক্তি থাকতে হবে।

এখানে বলা দরকার, এই প্রকল্পগুলি এবং তাদের বাস্তবায়নকাল নির্বাচন করা হয়েছে সকল পক্ষের মতামত নিয়েই। তাই এই মতামতকে উপেক্ষা করে অন্যান্য সকল প্রকল্পের আগে সরকার কেন এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করছে, তা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে বর্তমান সরকার আরো যে কয়টি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের চিন্তাভাবনা করছে, তার মধ্যে আড়িয়াল বিলে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রকল্পটি অন্যতম।

এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বেশ আলোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে আড়িয়াল বিল সংলগ্ন এলাকার মানুষ সঙ্গত কারণেই এই প্রকল্পের বিরোধীতা করেছেন এবং এর বিপরীতে একাধিক আওয়ামী লীগ নেতা প্রয়োজনে রক্ত দিয়ে হলেও এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মিডিয়াতে ঢাকা'র অদুরে নতুন একটি বিমানবন্দর করার বিপক্ষে বিভিন্ন মহল থেকে একাধিক যুক্তি দেয়া হয়েছে। অনেকে বলেছেন, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং সিলেটে যেহেতু ইতিমধ্যেই তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে এবং এই তিনটি বিমানবন্দরের পুরো সক্ষমতা যেহেতু এখনো কাজে লাগানো হচ্ছে না, সেহেতু বাংলাদেশের মত একটি ছোট দেশে নতুন আরেকটি বিমানবন্দর করার যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এই যুক্তিকে উপেক্ষা করে যদি নতুন আরেকটি বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে তা শুধু আবাদযোগ্য জমির পরিমাণকেই কমাবে। এতে অন্য কোন লাভ হবে না। আবার কেউ কেউ বলেছেন নতুন একটি বিমানন্দর না বানিয়ে বরং বর্তমান বিমানবন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর কথা।

তবে এই সকল যুক্তির বাইরেও এই প্রকল্পটির বিরোধীতা করার আরো যুক্তি রয়েছে। তবে সেই যুক্তি আলোচনার আগে পাঠকদেরকে জানাতে হবে একটি বাসস্টপ এবং প্লেনস্টপ বা এয়ারপোর্টের মধ্যে কি কি পার্থক্য রয়েছে।

ধরা যাক, সরকারের কোন এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর বাড়ি ঢাকা–চট্টগ্রাম হাইওয়ে সংলগ্ন কোন একটি গ্রামে। তিনি যখন ক্ষমতা পেলেন, তখন গ্রামবাসী তার কাছে আবদার করল তিনি যেন তাদের গ্রামের কাছেই একটি বাসস্টপ তৈরি করে দেন যাতে তারা সহজেই ঢাকায় তার বাসায় যাতায়াত করতে পারে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাদের আবদার রাখলেন এবং হাইওয়ের উপরে একটি নির্জন স্থানে একটি সুন্দর বাসস্টপ তৈরি করলেন। এখানে এর আগে কোন বাসস্টপ ছিল না। তাই এই স্থানে কোন বাস আগে কখনো থামতো না।

এখন প্রশ্ন হল, এই বাসস্টপে কি আগামীতে কোন বাস থামবে এবং গ্রামের জনগণ কি এই বাসস্টপের সুফল পাবে?

হ্যা। আশা করা যায় যে যদি গ্রামবাসী এই বাসস্টপে বাসের জন্য অপেক্ষা করা শুরু করেন, তাহলে একটা সময় আসবে যখন তা বিভিন্ন লোকাল বাসের ড্রাইভারদের নজরে পড়বে, এবং তারা তাদের সেবার চাহিদা যাচাই করে এই বাসস্টপে থামা শুরু করবে।

ধীরে ধীরে এই বাসস্টপটি জনপ্রিয়তা পাবে এবং এমন একটি সময় আসতে পারে যখন এসি বাসগুলোও এই বাসস্টপে অল্প সময়ের জন্য থামা শুরু করতে পারে।

কিন্তু এয়ারপোর্ট বাসস্টপের মত নয়। প্লেনের পাইলট চাইলেই তার প্লেনকে তার গন্তব্যের মাঝখানে হঠাৎ করে একটি এয়ারপোর্টে থামাতে পারবেন না। কারণ এর সাথে জড়িত রুট পারমিট, এয়ারলাইনের সামগ্রিক স্ট্র্যাটেজি এবং সেই এয়ারপোর্টের মাধ্যমে কি পরিমাণ যাত্রী আসা যাওয়া করছে, তার মোট সংখ্যা।

তাই একটি নতুন স্থাপিত এয়ারপোর্টকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন এই এয়ারপোর্ট ব্যবহারকারী যাত্রীসংখ্যা বাড়ানো এবং এই যাত্রীসংখ্যা বাড়ানোর দায়িত্বটি সবার আগে নিতে হবে স্থানীয় এয়ারলাইনকেই।

যেমন, ঢাকা'র অদুরে যদি একটি নতুন এয়ারপোর্ট তৈরি করা হয় এবং আশা করা হয় যে এই এয়ারপোর্টটি নতুন নতুন এয়ারলাইনকে আকৃষ্ট করবে, তাহলে এই এয়ারপোর্ট তৈরির আগে প্রয়োজন বাংলাদেশ বিমানের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেয়া এবং এই সংস্থাটিকে পুরোপুরি নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলা।

তবে শুধু বাংলাদেশ বিমানকে আধুনিক করলেই সব কাজ শেষ হয়ে যাবে না। বরং ঢাকা শহরে তথা বাংলাদেশে যাতে বিদেশীদের আগমন বাড়ে, সেজন্য নানামুখী পরিকল্পনা

হাতে নেয়ারও প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে শুধুমাএ বাংলাদেশ বিমানকে আধুনিক করলেই যাত্রী সংখ্যা বাড়বে না। কারণ একটি দেশে বিদেশীদের আগমন ঘটে মূলত দুটি কারণে; (১) ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলে, এবং (২) দেশের পর্যটন শিল্প বিকশিত হলে।

বিগত বছরগুলিতে বাংলাদেশে কি পরিমাণ বিদেশীদের আগমন ঘটেছে, সেই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য উপাও আমাদের কাছে নেই। বাংলাদেশের পর্যটন খাত সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে, এই ধরণের কোন দাবি নিশ্চয়ই কেউ করবেন না। তাই পর্যটন খাতে বিদেশীদের আগমন সাম্প্রতিকালে লক্ষণীয়ভাবে বাড়ার কথা নয়।

আবার বিদেশী বিনিয়োগের বর্তমান ধারাকে যদি একটি প্রক্সি সূচক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে অন্তত এই ধারণায় উপনীত হওয়া যাবে যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে বিদেশীদের আগমনের ধারাটি বিগত বছরগুলিতে খুব একটা বাড়েনি।

এই প্রসঙ্গে পাঠকদেরকে সিঙ্গাপুর, দুবাই, এবং কুয়ালা লামপুরের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

এই তিনটি শহরেই তিনটি অতি আধুনিক এয়ারপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। তবে সেই সাথে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস, এমিরেটস এবং মালয়শিয়ান এয়ারলাইন্সকেও বিশ্বমানে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস এবং এমিরেটস সারা বিশ্বে অন্যতম সেরা এয়ারলাইন হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই দুটি এয়ারলাইনের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যাওয়া যায়। ফলে এই দুটি এয়ারপোর্ট স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্বের দুটি অন্যতম ট্রানজিট রুট হিসাবে।

কিন্তু এই দেশগুলির সরকার শুধু এয়ারপোর্ট এবং এয়ারলাইনের উন্নয়ন করেই বসে থাকেনি। বরং সেই সাথে এয়ারপোর্ট সংলগ্ন শহরগুলিকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যাতে এই শহরগুলি ব্যবসা–বাণিজ্য এবং পর্যটনের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

কিন্তু বাংলাদেশ সরকার কি এই ধরণের কোন ব্যাপক ভিত্তিক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে? যদি না নিয়ে থাকে, তাহলে শুধু একটি আধুনিক এয়ারপোর্ট তৈরি করলেই কি তা বিশ্ববাসীর মাঝে জনপ্রিয়তা পাবে?

আমি এই প্রশ্নগুলি করছি বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় নীতিনির্ধারকদের কাছেই।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিটি

ঢাকার অদুরে নতুন স্যাটেলাইট সিটি গড়ার ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কি, তা আমরা আইএফডি থেকে প্রকাশিত প্রথম পলিসি পেপারেই উল্লেখ করেছি। "**ঢাকা নগরীর যানজট নিরসনে আইএফডি'র প্রস্তাবনা**" শিরোনামের এই পেপারটি যারা পড়েছেন, তারা নিশ্চয়ই আমাদের অবস্থানের কথাটি জানেন। আর যারা এখনো পেপারটি পড়েননি, সেই সকল পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা পেপারটির ১০৬ পৃষ্ঠার একটি অংশের পুনরুল্লেখ করছিঃ

".....বাংলাদেশ খুবই ছোট একটি দেশ এবং এখানে কৃষি জমির পরিমাণ খুবই কম। তাই ঢাকার মত মেগাসিটিগুলো যদি আনুভূমিকভাবে বিস্তৃত হতে থাকে এবং সরকারও যদি এই আনুভূমিক বিস্তারকে উৎসাহিত করে, তাহলে অদুর ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যখন ঢাকার বাইরের জেলা শহরগুলোও ঢাকার মধ্যে চলে আসবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই ধারা আমাদের মেনে নেয়া উচিত কিনা?

বাংলাদেশ কতটুকু ছোট একটা দেশ, তা একটি সাধারণ উদাহরণ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যাক।

ঢাকার উপর দিয়ে পুর্ব-পশ্চিম বরাবর যদি একটি চওড়া রাস্তা তৈরি করা যায় এবং সেই রাস্তায় যদি কোন ফেরি পারাপারের প্রয়োজন না থাকে এবং এর দুই প্রান্তে যদি থাকে কুষ্টিয়া সংলগ্ন ইন্ডিয়ার সীমানা এবং কুমিল্লা সংলগ্ন ইন্ডিয়ার সীমানা, তাহলে এই রাস্তা দিয়ে জোরে গাড়ি চালিয়ে পুর্ব-পশ্চিমে বাংলাদেশকে অতিক্রম করতে সময় লাগবে সর্ব্বোচ্চ ৮ ঘন্টা।

একই রকম রাস্তা যদি ঢাকার উপর দিয়ে উওরে ময়মনসিংহ হতে দক্ষিণে বাকেরগঞ্জ পর্যন্ত টানা যায়, তাহলেও উওর-দক্ষিণে বাংলাদেশকে অতিক্রম করতে প্রায় একই সময় লাগার কথা।

তবে তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত একই রাস্তা তৈরি করলে এই রাস্তা অতিক্রম করতে একটু বেশি সময় লাগবে।

*আমি এই উদাহরণটি দিচ্ছি এটা বলার জন্য যে, আমরা যদি প্রতিটি জেলাভিত্তিক একটি উন্নত এবং আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলি, তাহলে ঢাকার চারপাশে **নতুন স্যাটেলাইট সিটি** তৈরি করার কোন প্রয়োজন নেই। ঢাকার চারপাশে অবস্থিত জেলাশহরগুলিই এই স্যাটেলাইট সিটি'র কাজ করতে পারে। ফলে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর কিংবা কুমিল্লাতে থেকেও একটি পরিবার শুধুমাএ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ঢাকার নাগরিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে।*

এসটিপি'র প্রস্তাবনাতে প্রতিটি স্যাটেলাইট সিটির জন্য আলাদা আলাদা স্কুল, কলেজ, পানিব্যবস্থা ইত্যাদি তৈরি করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

কিন্তু আমরা বলছি, এই ব্যবস্থা ঢাকা'র চারপাশের বিভিন্ন জেলা শহরগুলিতে ইতিমধ্যেই তৈরি করা রয়েছে। তাই এই অবকাঠামোগুলির যদি উন্নয়ন করা যায়, তাহলে নতুন করে স্যাটেলাইট সিটি'র নামে অবকাঠামোতে খরচ করতে হবে না।

আমাদের বক্তব্য হল কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের উন্নয়ন না করে ঢাকার অদূরে রূপগঞ্জে একটি নতুন কলেজ গড়ার পরিকল্পনার পক্ষপাতি আমরা নই। ময়মনসিংহের জেলা হাসপাতালের সক্ষমতা এবং ডাক্তার সংখ্যা না বাড়িয়ে ধামরাইতে একটি নতুন সরকারি হাসপাতাল গড়ার পক্ষপাতি আমরা নই।

ফরিদপুর জেলা শহরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন না করে মাওয়াতে একটি নতুন স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণ করে সেখানে পানিসরবরাহের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করার কোন অর্থ নেই।

আমরা মনে করি, ঢাকার আশেপাশে নতুন স্যাটেলাইট সিটি নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হলে তা সরকারের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে এবং এর ফলে জেলা শহরগুলির অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের অর্থের অভাব দেখা দেবে। ফলে জেলা শহরগুলি হতে মানুষরা চলে আসবে নতুন গড়া স্যাটেলাইট সিটিতে এবং এই স্থানান্তরের কারণে

জেলাশহরগুলিতে কৃষি জমির পরিমাণও বাড়বে না, কারণ যে জমিতে ইতিমধ্যেই দালানকোঠা উঠে গেছে, সেখানে তো আর ফসল ফলানো যাবে না। তাই আমরা অনেক বেশি হারে আমাদের কৃষি জমি হারাবো।"

সরকারের প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিটি'র পাশাপাশি প্রস্তাবিত অন্যান্য স্যাটেলাইট সিটির ব্যাপারেও আমাদের অবস্থান একই। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের জেলাশহরগুলির উন্নয়ন না করে নতুন এই স্যাটেলাইট সিটি গড়া হলে তা শুধু আবাদি জমির পরিমাণকেই কমাবে।

তাই আমাদের প্রস্তাবনা হল, ঢাকা শহরের দক্ষিণে নতুন স্যাটেলাইট সিটি না গড়ে ফরিদপুর জেলা শহরকে একটি আধুনিক শহররুপে গড়ে তোলার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করতে পারে। সরকার ইতিমধ্যেই পদ্মা সেতুর মত একটি মেগা এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পটি যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে ঢাকা'র সাথে ফরিদপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নয়ন ঘটবে। তাই ফরিদপুরকে যদি একটি নতুন আধুনিক শহর হিসাবে গড়ে তোলা যায়, তাহলে ঢাকার অনেক বাসিন্দা ফরিদপুরে থেকেও ঢাকার অনেক নাগরিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

শেষ কথা

বর্তমান সরকার এই তিনটি মেগা প্রকল্প ছাড়াও আরো অসংখ্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে রাশিয়ার সহযোগিতায় তৈরি হচ্ছে পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প। বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় তৈরি হচ্ছে পদ্মা সেতু। খুব সম্ভবত সরকার গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরির কথাও সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। এই প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে খরচ হবে হাজার হাজার কোটি টাকা।

এখানে বলা দরকার, বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিকে ভবিষ্যতে আরো বাড়াতে এই ধরণের হাজার কোটি টাকার মেগা প্রকল্পের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, এই ধরণের প্রতিটি প্রকল্পই হাতে নেয়া হয়েছে সৎ উদ্দেশ্যে। সাধারণ জনগণের কল্যাণই এই সকল মেগা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রেক্ষাপটে আমরা বলতে চাই, সরকারের অন্যান্য প্রকল্পের ব্যাপারে আমাদের কোন প্রকার বিরোধীতা না থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি এই আর্টিকেলে আলোচিত তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে আরো বেশি গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত একাধিক রিপোর্ট এবং আর্টিকেল থেকে জানা যায়, আলোচিত এই তিনটি প্রকল্প নাকি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘পছন্দের’ প্রকল্প। এই দাবি যদি সত্যি হয়, তাহলে আমরা অবাক হব না। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন মানুষ। তার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ থাকতেই পারে। বিশেষ কোন প্রকল্পের সাথে যদি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নাম যুক্ত থাকে, তাহলে সেই প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করতেই পারেন। কারণ এখানে প্রকল্প শুধু যুক্তির খাতিরেই গ্রহণ করা হবে না; এর সাথে জড়িয়ে যাবে ব্যক্তিগত আবেগও।

কিন্তু মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শুধু একজন সাধারণ মানুষ নন। তিনি বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল দেশের একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। তাই তার পছন্দের একটি প্রকল্প মানুষের তেমন কাজে লাগছে না, বরং তা আরো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এই ধরণের কোন পরিস্থিতি তিনি নিশ্চয়ই চাইবেন না। আবার সেই প্রকল্পের সাথে যদি জড়িয়ে থাকে তার বিখ্যাত বাবার নাম, তাহলে তা বঙ্গবন্ধুর সম্মানকেই প্রশ্নবিদ্ধ করবে।

তাই সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমাদের অনুরোধ এই প্রকল্প তিনটি বাস্তবায়নের আগে যাচাই করে দেখা হোক এই প্রকল্পগুলি যে সকল সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে, একই সমস্যার সমাধানের জন্য এর চেয়েও কম ব্যয়বহুল অন্য কোন সম্ভাব্য সমাধান আছে কিনা। যদি থাকে, তাহলে সেই প্রকল্পগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হোক। এতে সমস্যার সমাধান যেমন হবে, তেমনি আমরা বেঁচে যাব একটি বিরাট খরচ থেকে।

এই তিনটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত দেয়ার আগে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীবর্গ, এবং ক্যাবিনেটের অন্যান্য মাননীয় সদস্যরা কি আমার এই কথাগুলো বিবেচনায় নেবেন?

লেখকের নিজের কথা

জন্মস্থান বাংলাদেশের সিলেট জেলা। বর্তমানে সৌদি আরবে একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিংয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেন যথাক্রমে ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে। পাশ করার সাথে সাথেই ঢাকা'র সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগে (সিপিডি) ইন্টার্ন হিসাবে গবেষণা জীবনের শুরু।

পরবর্তীতে আবারো মাস্টার্স করতে পাড়ি জমান ইউএসএ'তে। এবারের গন্তব্য ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড – কলেজ পার্ক। সেখান থেকে ফিন্যান্সে মাস্টার অফ সাইন্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন ২০০২ সালে।

ফিরে আসেন আবার বাংলাদেশে ২০০৩ এর শেষের দিকে। পুনরায় যোগ দেন গবেষণা কাজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময় থেকে পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হলেও লেখক হিসাবে পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটে সাপ্তাহিক ***'যায়যায়দিন'*** পত্রিকার মাধ্যমে। ২০০৪–২০০৬ সময়কালে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, এবং নীতিহীনতা নিয়ে তার একাধিক রচনা সাপ্তাহিক যায়যায়দিনে প্রকাশিত হয়েছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে তার একাধিক গবেষণা প্রবন্ধও রয়েছে।

মি. মাবরুর মাহমুদ বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। অবসর সময়ে তিনি টিভি দেখেন, গবেষণা করেন, ইন্টারনেট ব্রাউজ করেন, এবং পরিবারের সাথে সময় কাটান।

আইএফডি পরিচিতি

Ideas for Development (IFD) একটি ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংক (Virtual Think Tank)। এর মুল ধারণার প্রকাশ ঘটে ২০০৭ সালের জানুয়ারী ১৮ তারিখে একটি ইমেইলের মাধ্যমে। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির কোন অফিস নেই। এর ওয়েব এবং ইমেইল এড্রেসই এর ঠিকানা। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির উদ্যোক্তা সৌদি আরব প্রবাসী মি. মাবরুর মাহমুদ। তিনি একজন বাংলাদেশি নাগরিক। আইএফডি তারই চিন্তার ফসল।

এই ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংকটির মুল উদ্দেশ্য ইন্টারনেটের শক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক আইডিয়ার আদান প্রদানের মাধ্যমে দেশ, জাতি এবং সর্বোপরী মানবতার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। এটাই এই থিঙ্ক ট্যাংকটির মিশন স্টেটমেন্ট।

এই মিশন স্টেটমেন্ট প্রতিফলিত হয়েছে এই থিঙ্ক ট্যাংকটির লোগোতেও। এর লোগোতে চার রঙের ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। এই চারটি রঙের মাধ্যমে বিশ্বের চারটি জাতি বা রেসকে (Race) বোঝানো হয়েছে। আইএফডি বিশ্বাস করে বর্তমান বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং অশান্তি রয়েছে, তার মুলে রয়েছে জাতিগত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য। তাই আমরা বিশ্বাস করি এই নানাবিধ বৈষম্য যদি দুর করা যায়, তাহলে বিশ্বে অস্থিরতা অনেক কমে আসবে।

কিন্তু বৈষম্য কমানোর জন্য চাই নতুন নতুন উন্নয়ন আইডিয়া। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর জাতিগুলি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে নিত্যনতুন উন্নয়ন আইডিয়া তৈরি করছে এবং তার সফল বাস্তবায়ন করে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বল্পন্নোত দেশগুলি সম্পদ কম থাকার কারণে বা সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহারের কারণে এই প্রতিযোগিতায় দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। ফলে উন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে দারিদ্র্য এবং শোষণ।

বিভিন্ন আইডিয়া উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতিগত এই ব্যবধান কমানোর একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আইএফডির সৃষ্টি। আইএফডি বিশ্বের সকল চিন্তাশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী মানুষদের আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হতে চায়। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিন্তাশীল মানুষরা তাদের আইডিয়ার আদান প্রদান করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আইএফডির মাধ্যমে আইডিয়া আদান প্রদান করলে একজন উদ্ভাবক বেশ কয়েকটি সুবিধা পাবেন।

প্রথমত, উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আইডিয়া তৈরি করাই শেষ কাজ নয়, বরং এটি পুরো প্রক্রিয়াটির শুরু মাত্র। একজন উদ্ভাবককে শুধু আইডিয়া তৈরি করলেই চলবে না, বরং একটি সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষনের মাধ্যমে তার নতুন আইডিয়াটি দিয়ে সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যাবে তা উপস্থাপন করতে হবে একটি মডেলের আকারে। সেই মডেল আবার বাস্তবায়নযোগ্যও হতে হবে। এর অন্যথা হলে সেই আইডিয়াটির আসলে কোন মূল্য নেই।

আমাদের চারপাশে নতুন আইডিয়া দেয়ার লোকের আসলে কোন অভাব নেই। তবে একটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত এবং সর্বোপরী বাস্তবায়নযোগ্য আইডিয়া প্রণেতার সঙ্কট সর্বত্রই।

এই সঙ্কট সমাধানকল্পে আইএফডি একজন উদ্ভাবককে তার আইডিয়া সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পথ দেখিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে আইএফডি সম্ভব সবরকম গাইডেন্স প্রদান করবে এবং একটি সম্ভাবনাময় অথচ অপরিপক্ক আইডিয়াকে পরিপূর্ণ করতে সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করবে।

দ্বিতীয়ত, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠানোর জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থান থেকে যে কোন মাধ্যমে আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে পারেন।

তৃতীয়ত, বর্তমানে আইএফডি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করলেও ভবিষ্যতে অন্যান্য অনেক বিষয়ও ধীরে ধীরে এর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

চতুর্থত, আইএফডির মাধ্যমে কোন আইডিয়া প্রচার করা হলে সেই আইডিয়াটি যে একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, সে ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত থাকবেন। ফলে আইডিয়াটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। এখানে বলে রাখা দরকার, আইএফডি যে কোন আইডিয়া পেলেই তা প্রচার করবে না। বরং একটি আইডিয়ার মাধ্যমে সমাজ কতটুকু উপকৃত হতে পারে, সেটাই হবে আইডিয়া নির্বাচন করার মুল ভিত্তি।

এবং পঞ্চমত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে হলে উদ্ভাবককে কোন খরচ করতে হবে না, শুধুমাত্র পোস্ট কিংবা ইমেইলের খরচ ছাড়া। এই আইডিয়া যদি প্রচারযোগ্য হয়, তাহলেও উদ্ভাবককে কোন প্রকার ফি বা চার্জ দিতে হবে না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া দিলে তা চুরি হয়ে যেতে পারে। ফলে একজন আইডিয়ার উদ্ভাবক বঞ্চিত হবেন তার যথাযথ স্বীকৃতি থেকে।

এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আইএফডির কাছে কেউ কোন আইডিয়া পাঠালে তা উদ্ভাবকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও অন্য কোন নামে ব্যবহার করা হবে না। আমাদের মতে, শুধুমাত্র একজন আইডিয়ার কারিগরের পক্ষেই সম্ভব অন্য আরেকজন আইডিয়ার কারিগরকে যথার্থ মুল্যায়ন করা।

আইএফডি বিশ্বাস করে একটি আইডিয়ার প্রকৃত মুল্যায়ন হয় তখনই যখন তা আংশিক বা পুর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং তা মানুষের কাজে লাগে। এ দিক থেকে আইএফডির একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ অনেক উন্নয়নমূলক আইডিয়ার সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার সহ অন্যান্য অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাই আইএফডি এমন কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে আইএফডির মাধ্যমে কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া প্রচার হলেই তার সফল বাস্তবায়ন হবে। আইএফডি শুধু আইডিয়া তৈরি এবং প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হিসাবেই কাজ করবে। এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব আইএফডির নয়।

তবে আইএফডির কার্যক্রম শুধুমাএ আইডিয়া তৈরি এবং তার প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আইডিয়া তৈরি এবং তার সফল বাস্তবায়নের জন্য যেমন প্রয়োজন চিন্তাশীল মানুষ, তেমনি প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক নের্তৃত্ব, বলিষ্ঠ সরকার কাঠামো, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরী একটি শান্তিপুর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ। উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে চিন্তাশীল মানুষের যেমন জন্ম হবে না, তেমনি অস্থিতিশীল সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে চিন্তাশীল মানুষদের উন্নয়ন আইডিয়ার যথার্থ মুল্যায়ন এবং বাস্তবায়নও হবে না।

তাই উন্নয়ন আইডিয়া প্রচারের পাশাপাশি আইএফডি এমন একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করবে যার মাধ্যমে যেন সমাজে সৃষ্টিশীল মানুষদের সংখ্যা বাড়ে, তাদের যথার্থ মুল্যায়ন হয় এবং তাদের আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হয়। এই লক্ষ্যে আইএফডি বিভিন্ন ইস্যুতে তার মতামত ব্যক্ত করবে এবং বিভিন্ন রচনা প্রচার করবে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, আপনি যদি আপনার কোন আইডিয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হোন, এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এই আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হলে সমাজের কিছু কল্যাণ সাধিত হবে, তাহলে আইডিয়াটি আমাদেরকে লিখে পাঠান। এর জন্য প্রাথমিকভাবে ইমেইল করুন আমাদের ঠিকানায়। আমাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট।

আমাদের বিশ্বাস এই ধরণের আইডিয়া আদান প্রদানের মাধ্যমে সর্বএ নতুন নতুন চিন্তাশীল মানুষের বিকাশ ঘটবে। তাদের চিন্তালব্ধ আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হলে লাভবান হবেন সকলেই। তাই এর জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা। আইএফডির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক আইডিয়া প্রচারের জন্য যে কোন প্রকার সহযোগিতাকে তাই আমরা স্বাগত জানাই।

©Ideas for Development
ideasfd@gmail.com
www.ideasfd.org

[Keyword for Websearch:IFD Special Article 3, Mega Projects in Dhaka, Elevated Expressway, Bangabandhu Airport, Bangabandhu Satellite City]